Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-I, October 2024, Page No.01-09
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

‘সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য : সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন’ একটি বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

ছোটন মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The flow of history is rich from era to era. The view of historical recovery changes. Comparative accomplished student, researcher and professor of linguistics (Dr.) Rameswar Shaw has endeavored to present its nature to the first inquisitive reader through a comparative discussion of ancient Indian literature with other foreign literatures in his timeless work ‘Sanskrit and Prakrit Literature: Social Consciousness and Evaluation’. Here, starting from the Vedic period, classical Sanskrit-Ramayana, Mahabharata, Puranas and its sub-genres, Kalidas, pre-Kalidas and post-Kalidas eras of audio and visual poetry, in the light of the genius of famous poets and dramatists, characteristics of literary works, social consciousness and human values. Reconstructed in unbiased perspective. Also the origin and development of Prakrit-Pali language and literature and its brief introduction history are described. This is the first attempt to make a history of the entire ancient Indian literature in the light of social consciousness, setting it in the background of social life, and to make a consistent evaluation of the main authors and creations. Dr. Rameswar Shah’s book is not only a continuous chronology of writers and works and merely providing information, determining the importance of the socio-economic environment in which literature is developed, a conscious effort to analyze the trends, popular tastes and language styles of the society at that time reflected in literature has added new dimensions and scope to the discussion of the history of literature.

Keywords: Society, people, literature, culture, language, Vedas, Pali.

‘সংস্কৃত’ অর্থাৎ যার সংস্কার করা হয়েছে। এটি একটি বিশেষ যুগের একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষা। আনুমানিক খ্রিস্ট-পূর্ব ১৫০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মধ্যে যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা প্রচলিত ছিল তার দুটি রূপ পাওয়া যায়— একটি কথ্যরূপ বা মুখের ভাষা আর অপরটি হল সাহিত্যিক রূপ বা সাহিত্যের ভাষা। সেই সময়ের মুখের ভাষার নিদর্শন লিখিত অবস্থায় কিছু পাওয়া যায় না; তবে সাহিত্যিক রূপের সমৃদ্ধ নিদর্শন ছিল তা হল বৈদিক সাহিত্য। প্রাচীন ভারতীয় যুগের মুখের ভাষা ও বৈদিক সাহিত্যের ভাষা ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে ভারতীয় আর্য ভাষার দ্বিতীয় যুগে এসে ৬০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বৈদিক সাহিত্যের ভাষার ব্যাকরণের বিধি-বিধান অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে, ভাষা সহজ হয় এবং

ভারতের এক-এক অঞ্চলে ভাষার আলাদা আলাদা রূপ গড়ে উঠতে থাকে; এই সময় পাণিনি নামে একজন বিখ্যাত ব্যাকরণ রচয়িতা (খ্রি.পূ. ৫ম শতাব্দী) উদীচ্য ও মধ্যদেশীয় অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষদের ভাষার সংমিশ্রণে তাকে ব্যাকরণের বিধি-বিধানে বেঁধে বিশেষভাবে মার্জিত করে ভাষার যে নবরূপ গড়ে তুললেন সেটিই হল 'সংস্কৃত ভাষা'। যা 'ক্লাসিকাল সংস্কৃত' বা 'লৌকিক সংস্কৃত' নামে পরিচিত। এই ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ছিল পরবর্তীকালের অঞ্চল বিশেষের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের ভাষা; যা বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের ভাষা থেকে ছিল অনেক দূরবর্তী। তাই জনসাধারণের জীবন্ত ভাষাস্রোত থেকে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত ক্রমে ক্রমে যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ততই তা ব্যাকরণের নিগড়ে বাঁধা পড়ে আরও কৃত্রিম হয়ে গেছে এবং শেষপর্যন্ত **'মৃত ভাষা'**য় পরিণত হয়েছে। তবে পণ্ডিতদের সাহিত্য সৃষ্টিতে এ ভাষা ছিল অতিসমৃদ্ধ। এই ভাষাতেই আদি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ রচিত হয়েছে। অশ্বঘোষ থেকে কালিদাস ও কলিদাসোত্তর যুগের ভবভূতি, ভারবি, ভর্তৃহরি, বাণ্‌ভট্ট প্রমুখের রচনায় এই ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যে নবজাগরণ হয়েছিল, তার প্রেক্ষাপটে প্রাচীন বিদ্যার পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে বাঙালি শিক্ষিত সমাজের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রাথমিক ইতিহাস হিসেবে বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) রচনাটির অগ্রণী ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তবে বাংলা ভাষায় সমাজচেতনার আলোকে সংস্কৃত-প্রাকৃত-পালি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা এবং প্রধান প্রধান স্রষ্টা ও সৃষ্টির ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রথম প্রয়াস দেখা যায় অধ্যাপক (ড.) রামেশ্বর শ'-কৃত **'সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য : সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন'** শীর্ষক গ্রন্থে। ড. রামেশ্বর শ'-র এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে পুস্তক বিপণি থেকে। প্রথম প্রকাশের সময় গ্রন্থটির একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য। যেটি বর্তমান সংস্করণেও যথারীতি পুনর্মুদ্রিত হয়। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে বহুভাষাবিদ্ বিশ্বসাহিত্য-রসিক সমালোচক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়কে। এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক ড. রামেশ্বর শ' প্রথম প্রকাশের মুখবন্ধে জানাচ্ছেন—

> "মৃত সব কবিদের মাংসকৃমি না ঘেঁটে, তা ক্ষেত্রান্তরের জন্যে সরিয়ে রেখে শুধু সাহিত্য আলোচনায় মন দিয়েছি।"[১]

রামেশ্বর শ'র এই গ্রন্থটি শুধু লেখক ও রচনার ধারাবাহিক কালনির্ণয় ও নিছক তথ্য পরিবেশনই নয়, যে আর্থসামাজিক বাতাবরণে সাহিত্য গড়ে ওঠে তার গুরুত্ব নির্ধারণ, সাহিত্যে প্রতিফলিত তৎকালীন সমাজের যুগরুচি, জনরুচি ও ভাষাশৈলী বিশ্লেষণের সচেতন প্রয়াস সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় সংযোজন করেছে নতুন মাত্রা ও ব্যপ্তি। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের কৃতী ছাত্র, গবেষক ও অধ্যাপক ড. শ' প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য বিদেশি সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে তার স্বরূপটি প্রথম জিজ্ঞাসু পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। সমাজ জীবনের পটভূমিকায় বিন্যস্ত করে সমাজচেতনার আলোকে সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনা এবং প্রধান প্রধান স্রষ্টা ও সৃষ্টির ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রয়াস এই প্রথম।

সংস্কৃত সাহিত্য বলতে বৈদিক-সাহিত্য (প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার যুগ— ১০০০ খ্রি.পূ. থেকে ৬০০ খ্রি.পূ.) এবং ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্য (মূলত মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগ— ৬০০ খ্রি.পূ. থেকে ১০০০

খ্রি.) -এই ব্যাপক অর্থকে গ্রহণ করেই দুই যুগের দুই সাহিত্য ধারা-উপধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। বৈদিক সাহিত্য বলতে মূলত 'বেদ'-কেই বোঝায়। 'বেদ' আর্যদের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থ তথা অধ্যাত্মশাস্ত্র। ড. শ' দেখিয়েছেন, 'বিদ্' ধাতু থেকে এই 'বেদ' শব্দটির উৎপত্তি। √বিদ্ + অ (ঘঞ) = বেদ। 'বেদ'-এর বাণীস্রোত দীর্ঘকাল ধরে সমাজে প্রবাহিত হয়ে আসছে। পরবর্তীকালে মানুষজন বেদের এই বাণী ঋষির কাছ থেকে শ্রবণ করত। তাই বেদের অপর নাম হয় 'শ্রুতি'। বেদের রচনাকাল নিয়ে নানা মুনির নানা মত আছে। এঁদের মধ্যে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-এর মত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত বলে এই মতটিই গ্রহণ করেছেন ড. শ'। তাঁদের মতানুসারে, আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে বেদ রচিত হয়েছিল বলে ধরা হয়। বেদ মূলত চারটি— ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব। প্রত্যেকটি বেদের আবার তিনটি করে অংশ—(১) সংহিতা, (২) ব্রাহ্মণ ও (৩) উপনিষদ-আরণ্যক। এগুলির আবার চারটি করে শাখা। যথা—

- **সংহিতা**—ঋক্সংহিতা, সামসংহিতা, যজুঃসংহিতা এবং অথর্বসংহিতা।
- **ব্রাহ্মণ**—ঋক্বেদের ব্রাহ্মণ, সামবেদের ব্রাহ্মণ, যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ এবং অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ।
- **উপনিষদ-আরণ্যক**— ঋক্বেদের উপনিষদ-আরণ্যক, সামবেদের উপনিষদ-আরণ্যক, যজুর্বেদের উপনিষদ-আরণ্যক এবং অথর্ববেদের উপনিষদ-আরণ্যক।

বৈদিক যুগের আর্য জীবনধারার প্রতিফলন ঘটেছে বৈদিক সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখায়। প্রত্যেকটি বেদের রচনাকাল ভিন্ন। ফলত সমাজ জীবনের যুগগত ধর্ম-দর্শন, জীবনবোধও আলাদা আলাদা। অধ্যাপক শ' বেদের এই প্রত্যেকটি ভাগ ও উপভাগগুলির অল্পবিস্তর পরিচয় দিয়ে সামাজিক পটভূমিকায় তার শৈল্পিক মূল্যায়নে অবতীর্ণ হয়েছেন। সংহিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম হল ঋগ্বেদ-সংহিতা। এটি ছিল প্রাচীন বৈদিক যুগের রচনা। এর সময়সীমা আনুমানিক ১২০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্ট- পূর্বাব্দের মধ্যে ধরা হয়ে থাকে। আর বাকি সংহিতাগুলিকে অর্বাচীন বৈদিক যুগের রচনা হিসেবে ধরা হয়। এগুলির সময়সীমা হল ১০০০ থেকে ৮০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ। তাই ঋক্বৈদিক-সংহিতা যুগের সামাজিক পটভূমিকা পরবর্তী সংহিতাগুলির থেকে পৃথক। ঋক্বেদের যুগের সামাজিক কাঠামো কেমন ছিল? কেমন ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা? জীবিকা ব্যবস্থাই বা কী ছিল? এ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ-নিরীক্ষণ করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সুনিপুণভাবে আলোচনা করেছেন ড. রামেশ্বর শ'। তিনি জানাচ্ছেন—

> "সে যুগের আর্যদের অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি ও জীবিকার মূল আশ্রয় ছিল প্রধানত শিকার ও কৃষিকাজ। শিকারনির্ভর হলে জনগোষ্ঠীর খানিকটা যাযাবর হতে বাধ্য, আবার কৃষিনির্ভর হলে জীবনযাত্রা স্থিতিশীল হয়। ভারতীয় আর্যদের জীবনযাত্রা প্রথম দিকে শিকারনির্ভর ছিল, পরে ক্রমশ মূলত কৃষিনির্ভর হয়ে উঠে।"[২]

ঋগ্বেদ-সংহিতার যুগে এই কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আর্যদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থাকে অংশত নিয়ন্ত্রণ করতো। আর্যদের সমাজের মূল ভিত্তি ছিল একান্নবর্তী পরিবার। সমাজে পুরুষেরাই ছিল প্রধান। পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজ ব্যবস্থায় পিতাকে বলা হত গৃহপালিত। তবে পরিবারের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব পুরুষের হাতে থাকলেও নারীই ছিল পরিবারের আভ্যন্তরীণ কর্ত্রী। ঋক্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ-সূক্তে চার বর্ণের কথা পাওয়া যায়। যদিও বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্যদের মধ্যে কোনো বর্ণভেদ বা জাতিভেদ ছিল না। পরে বৃত্তিভেদ অনুসারে চারটি বর্ণ গড়ে ওঠে— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও

শূদ্র। বৈদিক যুগের শেষের দিকেও এই বর্ণ বিভাগ ছিল সুস্থ একটি গুণগত ও কর্মগত সমাজ-বিন্যাস মাত্র। আর এই চারটি বর্ণের মধ্যে উঁচু-নিচু বোধ ছিল না, কোনো ভেদ-বোধও ছিল না। ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তে কথিত আছে— ব্রহ্মার মুখ থেকে— ব্রাহ্মণ, হাত থেকে— ক্ষত্রিয়, উরু (thigh) থেকে— বৈশ্য, পা-যুগল থেকে— শূদ্রের উৎপত্তি। —এই সূক্ত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঋগ্বেদ সংহিতার যুগে সমাজের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য ঐক্য ছিল। ঋক্-বৈদিক সমাজের অপর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। বৈদিক সমাজে শিক্ষাদান কোনো বৃত্তি ছিল না, ছিল ব্রত। প্রকৃতির শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে শিক্ষা ছিল সর্ববিধ যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত স্বতঃউৎসারিত, স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক। এটি ছিল ব্রহ্মচর্য-পর্ব। এই পর্ব শেষ করে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করত আর্য-যুবকরা। এই পর্বে তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিবাহিত জীবনে আদর্শ সন্তানলাভ করে মানবজাতির কল্যাণ-সাধন করা। পঞ্চাশ বছর বয়সে আবার গার্হস্থ্যজীবন ত্যাগ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে হতো অর্থাৎ বনে গিয়ে পরিপূর্ণ ত্যাগের দীক্ষা গ্রহণ করতে হতো। সবশেষে সন্ন্যাসজীবনে শুধু অধ্যাত্ম-সাধনায় জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটাতে হতো। জীবনের এই চারটি স্তরকে বলা হতো চতুরাশ্রম। উত্তরকালে বর্ণবিভাগ ও এই চতুরাশ্রম প্রথা ভারতীয় সমাজধারার মূল কাঠামো রচনা করে।

ঋক্‌বেদ-সংহিতার থেকে অন্যান্য সংহিতাগুলির রচনাকাল ছিল অনেকটাই পৃথক। তাই ড. রামেশ্বর শ' ঋক্-সংহিতার সমাজচেতনা সম্পর্কে আলোচনা এবং তার মূল্যায়ন অন্যান্য সংহিতা থেকে পৃথকভাবে করেছেন। অন্যান্য সংহিতার সমাজচেতনা ও কাব্যমূল্য সম্পর্কে একত্রে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি জানান যে— সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদ সংহিতার যুগে পরিবারের আশ্রয়ে গড়ে ওঠা সমাজ জীবনের বন্ধন অনেকটা দৃঢ় হয় এবং পরিবার অর্থে 'কুল' কথাটির প্রচলন হয়। ঋক্‌বেদের যুগের উদার বর্ণবিন্যাস ক্রমে এই যুগে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ রূপে কঠিন হতে থাকে। সংগীত ও নৃত্য এ যুগে আর্যদের আনন্দ উপভোগের মাধ্যম রূপে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে। বাঁশি, বীণা, শঙ্খ, জয়ঢাক প্রভৃতি আর্যদের ছিল প্রধান বাদ্যযন্ত্র। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অপুপ (ঘৃত মিশ্রিত পিঠা), ওদন প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। মাংসহার ব্যাপকভাবে প্রচলন ছিল। সুরা ও সোমরস পান এ যুগেও প্রচলিত ছিল। নিধীবাস, অধিবাস প্রভৃতি পোশাকের মধ্যে প্রধান ছিল। উত্তরকালের সংহিতাগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাম-যজুঃ-অথর্ব-সংহিতার যুগে ভারত ভূমিতে যতই তাঁরা গুছিয়ে বসলেন, শিল্প-সংগীতের সাধনায় ততই তাঁরা আত্মস্থ হওয়ার সুযোগ ও অবকাশ পেলেন। উত্তরকালে সংগীতে এই সংহিতার অবদান অপরিসীম। এর যে স্বরলিপি পরে রচিত হয় তার নাম হল 'গান'। কথার সঙ্গে সুরের সার্থক সমন্বয়ের দিক থেকে সাম-সংহিতার সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীতের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

প্রত্যেকটি বেদের সংহিতাগুলির মতো অপর একটি অংশ হল ব্রাহ্মণ। সংহিতার মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যা এবং যাগ-যজ্ঞক্রিয়ার বিধিবিধান নিয়ে ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি রচিত। 'ব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ হল ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক প্রদত্ত যজ্ঞের ব্যাখ্যা। এগুলি গদ্যে লেখা। প্রত্যেক সংহিতার যাগ্-যজ্ঞ ব্যাখ্যার জন্য স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ গ্রন্থ আছে। যেমন— ঋগ্বেদ-সংহিতায় ব্রাহ্মণ দুটি— ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণ, সামবেদ-সংহিতায় ব্রাহ্মণ আটটি— তাণ্ড্য, ষড়্বিংশ, মন্ত্রদৈবত, আর্ষেয়, সামবিধান, সংহতিতোপনিষদ, বংশ ও জৈমিনীয়, যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ দুটি— তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এবং সৎপথ ব্রাহ্মণ, অথর্ব-বেদের একটি ব্রাহ্মণ— গোপথ। এই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির সামাজিক পটভূমি আলোচনা ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে ড. শ' জানিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির রচনাকাল শেষের দিকের সংহিতাগুলির প্রায় সমসাময়িক এজন্য এগুলির সমাজ-পটভূমিও অনুরূপ। এ পর্বে

সমাজজীবনে সুদৃঢ় কাঠামো রচিত হয়েছে। আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে। চারটি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সুদৃঢ় হয়েছে এবং ব্রাহ্মণদের পুরোহিতবৃত্তি অনেকটা পেশা হয়ে উঠেছে। মূল্যায়নে তিনি বলেছেন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি সাহিত্য হিসেবে নিরস হলেও এগুলির একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি থেকেই তৎকালীন ধর্মীয় চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। আর্যদের গদ্যসাহিত্য হিসেবেও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উত্তরকালের বিপুল পৌরাণিক সাহিত্যের পূর্ব সূচনা হয়েছে এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির আখ্যান-উপাখ্যানে।

বেদ-এর শেষভাগ হল— আরণ্যক-উপনিষদ। আরণ্যক = অরণ্য সম্পর্কিত। অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে অরণ্যবাসীর ধর্মজীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এখানে আছে। আরণ্যকের দার্শনিকতত্ত্ব পরিণতি পেয়েছে উপনিষদে। উপ = কাছে, নি = নিশ্চিত রূপে, সদ্ = বসা। অর্থাৎ উপনিষদ শব্দের অর্থ হল ব্রহ্মের কাছে বসা বা অবস্থান করা। এটিই বেদের অন্ত বা শেষ লক্ষ্য। তাই উপনিষদ বেদান্ত নামেও পরিচিত। সংহিতা বা ব্রাহ্মণের মতো প্রত্যেক বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ পৃথক পৃথক আছে। এইসব আরণ্যক-উপনিষদগুলির সামাজিক পটভূমি আলোচনা ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে ড. রামেশ্বর শ' বলেছেন যে, সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদের রচনাকাল ৮০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মধ্যে। ফলত ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির মধ্যে যাগ্-যজ্ঞের যে কর্মকাণ্ড দেখা গিয়েছিল আরণ্যক-উপনিষদের সমাজচিত্তে তার একটা প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন দেখা যায়। আরণ্যকের মধ্যে দার্শনিক ভাবনা, মরমীয়া অনুভূতি, প্রতীকধর্মী প্রকাশভঙ্গির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। উপনিষদের সামাজিক পটভূমিকা সংহিতার সামাজিক পটভূমি থেকে অনেকটাই পৃথক। উপনিষদের যুগে বৈদিক দেবতাদের প্রাধান্য অনেক কমে এসেছিল। উপনিষদগুলি ছিল দার্শনিক সমৃদ্ধিতে অপরিসীম।

বৈদিক সাহিত্য থেকে সূত্র সাহিত্যের উদ্ভব। সূত্র হল ছোট আকারের ঘনীভূত বক্তব্যসমূহ। এর দুটি ভাগ— বেদাঙ্গ ও দর্শন। বেদাঙ্গ আবার ছ'টি ভাগে বিভক্ত—

- **শিক্ষা—** বৈদিক মন্ত্র যথাযথভাবে পাঠ করার জন্য ধ্বনির বিশুদ্ধ উচ্চারণ
- **ছন্দ—** বেদের ছন্দ সম্পর্কিত
- **ব্যাকরণ—** ভাষা ব্যবহারের নিয়ম
- **নিরুক্ত—** শব্দের উৎপত্তির ব্যাখ্যা
- **জ্যোতিষ—** গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে
- **কল্প—** যাগ-যজ্ঞের বিধান। এই কল্প বা কল্পসূত্রের চারটি অঙ্গ দেখিয়েছে— শ্রৌততসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্কসূত্র।

—এগুলির সমাজচেতনা সম্পর্কে আলোচনা ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে ড. শ' বলেছেন মূল বেদাঙ্গগুলির রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্ট-পূর্ব ৬০০ থেকে ২০০ অব্দের মধ্যে। সুতরাং বৈদিক যুগের বেশ পরবর্তীকালের রচনা হল এই বেদাঙ্গগুলি। প্রকৃতির সঙ্গে বৈদিক জীবনের যে নিবিড় যোগ ছিল, সমাজ-বিধির মধ্যে মানব হৃদয়ের যে মুক্ত ঔদার্য ছিল, বেদের পরবর্তী যুগে তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সভ্যতার কৃত্রিম বন্ধন আসে, আধ্যাত্মিক অনুভূতির বদলে ধর্মের বিধি-বিধান শিথিল হয়, মানবিক জীবননীতির বদলে যান্ত্রিক সমাজ-বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। বেদাঙ্গ হল এই সমাজেরই সৃষ্টি, এরই ধারক। এই বেদাঙ্গগুলির সাহিত্যমূল্য বিশেষ না

থাকলেও এগুলির সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। কল্পসূত্রের মধ্যে যান্ত্রিকতা যা-ই থাক, এতে ওই সময়কার সমাজের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, ধর্মবোধ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়, তা ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষকে একত্রে বিচার করলে দেখা যায় সেগুলি ভাষাবিজ্ঞান, অলংকারশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি আধুনিক বিষয়গুলির বিভিন্ন দিকের পূর্বপ্রস্তুতির পথনির্মাণ করেছে।

'সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য : সমাজচেতনা ও মুল্যায়ন' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ড. শ' ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যগুলি নিয়ে আলোকপাত করেছেন। পাণিনি কর্তৃক মার্জিত সংস্কৃতকে বলা হয় 'লৌকিক সংস্কৃত'। আর এই লৌকিক সংস্কৃতকেই মনীষী ভিণ্টারনিৎস নাম দিয়েছেন 'ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত'। তবে সাহিত্যের সূক্ষ্ম বিচারে যথার্থ ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্য হল কালিদাস এবং তাঁর নিকটবর্তী যুগের সাহিত্য। কোনো রচনার সমাজচেতনা বলতে সাধারণত ওই রচয়িতার যুগগত জীবনপটভূমির রূপায়ণকেই বোঝায়। রামায়ণ থেকে মহাভারতের সামাজিক পটভূমির সেরকম কোনো ব্যবধান ছিল না। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে আর্যদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য ও কুটির-শিল্প। ধান, গম, যব, আখ, কুলত্থ-কলাই, মাষকলাই, তিল, চণক, মরিচ প্রভৃতি প্রধান ফসল ছিল। আর্যরা পশুপালন করতেন নানা উদ্দেশ্যে। বৃষ পালিত হতো ভূমিকর্ষণের জন্যে, গরু পালিত হতো দুগ্ধের জন্যে। দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসা ছিল। গরু পূজিত প্রাণী ছিল। গোহত্যা নিষিদ্ধ ছিল। ঘোড়া, উট, খচ্চর যাতায়াতের জন্যে বাহক হিসাবে ব্যবহৃত হত। খাদ্যশস্য, পশুসম্পদ, খনিজদ্রব্য ও কুটির-শিল্পের সামগ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য আর্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কুটির-শিল্পের মধ্যে কাঁসা ও পিতলের কাজ সোনা-রূপার অলংকার-নির্মাণ, শাঁখার কাজ, কাচের কাজ, বস্ত্রবয়ন ও বস্ত্র-সেলাই ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ছিল। কৃষি ও শিল্প ছাড়া অন্যান্য জীবিকার লোকের কথাও রামায়ণ-মহাভারতে পাওয়া যায়। যেমন— সঙ্গীতকার, চারণ-কবি, যাদুবিদ্, স্থপতি, সূত্রধর, বৈদ্য ইত্যাদি। সামাজিক কাঠামো ছিল সুপরিকল্পিত। পরিবারের অভ্যন্তরীণ বন্ধন ছিল সুদৃঢ় ও প্রীতিপূর্ণ। ভারতের জাতীয় জীবনের গঠনে এবং সামাজিক মূল্যবোধের নিয়ন্ত্রণে রামায়ণ-মহাভারতের অবদান সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী। মহাভারতের মধ্যে ভারতবর্ষের দীর্ঘকালের ধর্মীয় বিশ্বাস, দার্শনিক চিন্তা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক আচার-আচরণের ইতিহাস প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিধৃত রয়েছে। মহাভারত একাধারে জাতীয় মহাকাব্য, হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ এবং ভারতের সামাজিক ইতিহাস।

সংস্কৃতে আর কতকগুলি গ্রন্থকে 'পুরাণ' আখ্যা দেওয়া হয়। এগুলির সামাজিক পটভূমি রামায়ণ-মহাভারত থেকে বিস্তর ব্যবধান দেখা যায়। উত্তর-বৌদ্ধ যুগে হিন্দু ধর্মের পুনর্গঠনের জন্যই মূলত পুরাণ গ্রন্থের পরিকল্পনা। পুরাণগুলি হিন্দু সমাজে এত প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, পরবর্তীকালকে পৌরাণিক যুগ বলে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণির পুরাণের অল্প বিস্তর পরিচয় দিয়ে ড. শ' তার সমাজচেতনা সম্পর্কে আলোচনা ও মূল্যায়ন করেছেন। ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনের ইতিহাস, তার জীবনদৃষ্টি, ধর্মীয় সংস্কার এবং আচার-আচরণের নিঁখুত দলিল হল এই পুরাণগুলি। ভারতীয় হিন্দুসমাজ যখন নানা দিক থেকে বিপর্যয়ের মুখে সেই প্রেক্ষাপটে রচিত হয় এই পুরাণগুলি। হিন্দু ধর্মের এই বিপর্যয়ের সময় হিন্দু সমাজনেতারা চেষ্টা করলেন হিন্দু সমাজকে আচার-আচরণের কঠোর নিয়মের বন্ধনে বেঁধে দিতে যাতে অন্য ধর্মের প্রভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা স্বধর্মভ্রষ্ট না হয়। আর এই চেষ্টা করলেন গল্প-কাহিনির সাহায্যে হিন্দু ধর্মের তত্ত্বকথা সহজ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। গল্পকথার প্রাধান্য রেখে আচার-অনুষ্ঠান-প্রধান ধর্মের বিধান দিয়ে তাই তাঁরা রচনা করলেন এই বিরাট পৌরাণিক সাহিত্য। সমাজ-জীবনের তথ্য

উপস্থাপনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পুরাণ হল বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বায়ু পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, ভাগবত পুরাণ এবং কূর্মপুরাণ। প্রধান পুরাণগুলিতে হিন্দু ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। ঈশ্বর-বিশ্বাস, মূর্তিপূজা, সংস্কার ও কুসংস্কার, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম, সামাজিক উৎসব ও আচার-আচরণের এত বিশ্বস্ত বিবরণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।

পঞ্চম অধ্যায়ে অধ্যাপক রামেশ্বর শ' যথার্থ ক্লাসিক্যাল সাহিত্য অর্থাৎ কালিদাস এবং তাঁর নিকটবর্তী যুগের সাহিত্যধারা-উপধারা সম্পর্কে স্বল্পবিস্তর পরিচয় দিয়েছেন এবং তার সমাজচেতনা সম্পর্কে আলোচনা ও মূল্যায়ন করেছেন। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতো ড. শ' এই সাহিত্যশাস্ত্রকে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন— শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য। শ্রব্যকাব্যের তিনটি ভাগ— পদ্যকাব্য, গদ্যকাব্য এবং গদ্য-পদ্য মিশ্র কাব্য বা চম্পূকাব্য। পদ্যকাব্যের আবার তিনটি শ্রেণি— মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং কোষকাব্য। খণ্ডকাব্যকে আবার— তন্ময়, মন্ময়, গীতিকাব্য ও গাথাকাব্য ভাগে ভাগ করা হয়। গদ্যকাব্য— কথা ও আখ্যায়িকা এই দুই ভাগে বিভক্ত। চম্পূকাব্যের কোনো বিভাগ নাই। শ্রব্যকাব্যের মতো দৃশ্যকাব্যেরও বিভাগ আছে। এর প্রধান দুটি শ্রেণি— রূপক এবং উপরূপক। রূপক আবার দশভাগে বিভক্ত— নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী এবং প্রহসন। আধুনিককালে বাংলায় 'নাটক' কথাটির অর্থবিস্তার হয়েছে এবং দৃশ্যকাব্য অর্থেই নাটক শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। উপরূপক আঠারোটি ভাগে বিভক্ত— নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লিশ এবং ভাণিকা। দৃশ্যকাব্যের এত সূক্ষাতিসূক্ষ্ম শ্রেণিবিভাগ থাকলেও সব শ্রেণিগুলি পূর্ণ বিকাশিত হয়নি। মাত্র নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, প্রহসন, নাটিকা ও সট্টকের বিশেষ বিকাশ দেখা যায়।

কালিদাস-পূর্ব যুগের কবি, নাট্যকার অশ্বঘোষের আবির্ভাব সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। কুষাণ নৃপতি কনিষ্কের রাজত্বকালে অশ্বঘোষের মতো বৌদ্ধ কবি, নাট্যকারের একাধিক গ্রন্থ রচনা সংস্কৃত সাহিত্যেকে সমৃদ্ধ করে। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' প্রধানত বুদ্ধজীবনী হলেও পূর্ববর্তী যুগের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ ও সমসাময়িক সমাজ জীবনের পরোক্ষ ছায়াপাথ ঘটেছে। যুগ-সচেতন কবি কল্পনার সঙ্গে বাস্তব তথ্যের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন তা কালিদাস-পূর্ব যুগের এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

কালিদাস ছিলেন নিজেই একটা যুগ। গোটা যুগের সৃষ্টির বিশালতা ও বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। জীবনদৃষ্টি ও শিল্পকলার দিক থেকে প্রাচীন ভারতের কবি ও নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি। ইংরেজি সাহিত্যের শেক্সপীয়র ও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের নাম যেমন জড়িত, সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে কালিদাসের নাম সেইরূপ চিরপ্রথিত। কালিদাসের জীবন ও আবির্ভাবকাল সম্পর্কে নানা মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত কালিদাস গুপ্ত-সাম্রাজ্যের কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কালিদাসের যুগে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। বর্ণভেদে বৃত্তিভেদ আরোপ করার চেষ্টা হয়েছিল। বিবাহ-ব্যাপারে জাতিভেদ প্রথা অনুসৃত হতো। হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের লোকেদের আহারে-বিহারে সাত্বিক বিধান মেনে চলার নিয়ম ছিল। চণ্ডাল ও শূদ্ররা সমাজে অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হতো। সমাজে নারীর ভূমিকা ছিল বিচিত্র। উচ্চশ্রেণির মধ্যে মহিলারা শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেতো। মেয়েদের স্বয়ংবরা হবার রীতি প্রচলিত ছিল। এইসব সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণ, তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি-

সবেরই প্রতিফলন ঘটেছে কালিদাসের কাব্য-নাটকাদিতে। এই সামাজিক পটভূমিকার প্রেক্ষিতে ড. শ' মূল্যায়নে জানিয়েছেন কালিদাসের কাব্য চিত্রাশ্রয়ী। তাঁর মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এমনকি দৃশ্যকাব্যেও অপূর্ব চিত্রসম্ভার দেখা যায়। যার মধ্য দিয়ে তিনি রচনা করেছেন মানব প্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক নিবিড় যোগসূত্র। বিষয়বস্তু নির্বাচনে কালিদাস ঐতিহ্যপন্থী হলেও তার নবরূপায়ণে তাঁর প্রতিভার মৌলিকতা স্বয়ংপ্রভ। কালিদাসের রচনায় কাহিনি বৃত্তের নিটোল গঠনের চেয়ে বর্ণনার পারিপাট্য বেশি। বর্ণনায় উপমাপ্রয়োগ ও বর্ণসমাবেশ দু-ই সমান কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। কালিদাস মূলত ক্লাসিক প্রতিভার অধিকারী হয়েও তাঁর প্রাণের অন্তঃস্থলে ধ্বনিত হয়েছে এক রোমান্টিকতার সুর।

কালিদাসোত্তর যুগে কালিদাসের শুধু অনুকরণ নয়, আশ্চর্যজনক মৌলিক প্রতিভারও পরিচয় মেলে। নাট্যসাহিত্যে এরকম দু'জন নাট্যকার হলেন বিশাখদত্ত ও শূদ্রক। এই দু'জন নাট্যকারের ব্যক্তিজীবন ও আবির্ভাবকাল সম্পর্কে মতবিরোধ থাকলেও দুজন নাট্যকারকেই গুপ্তযুগের নাট্যকার হিসেবেই ধরা হয়। নাট্যকার বিশাখদত্ত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রাজনৈতিক নাটক রচনা করে সংস্কৃত সাহিত্যে অভিনবত্ব সাধন করেছেন। তাঁর প্রধান নাট্যরচনা 'মুদ্রারাক্ষস' রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিলেও পরোক্ষভাবে তৎকালীন সমাজচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের গঠন, বিধিব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর নাটকে। সব মিলিয়ে লেখক ড. শ' বলেছেন তাঁর রচনারীতি সরল ও স্বচ্ছন্দ। সমাস ও অলংকারের অতি ব্যবহার নেই, নেই কাব্যের লালিত্য ও পেলবতার আকর্ষণ। তবে তাঁর রচনারীতিতে আছে বিষয়বস্তুর উপযোগী গদ্যের তীক্ষ্ণতা ও প্রাখর্য।

ড. রামেশ্বর শ' সমাজচেতনা ও মূল্যায়নের আলোকে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পাশাপাশি গ্রন্থের শেষ তথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রাকৃত ও পালি সাহিত্যের ইতিহাসেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম স্তরে প্রাকৃত ভাষা জনগণের মুখের ভাষা ছিল বলে ওই স্তরে বিশেষ কিছু সাহিত্য রচিত না হলেও দ্বিতীয় স্তরে যখন প্রাকৃত ভাষায় সাহিত্য রচিত হয় তখন সেই ভাষা আর জনগণের মুখের ভাষা ছিল না, হয়ে উঠেছিল সাহিত্যের ভাষা। প্রাকৃত কবিরা যথেষ্ট সমাজ সচেতন ছিলেন। বৃহত্তর সমাজের চিত্র থেকে শুরু করে ব্যক্তি হৃদয়ের সূক্ষ্ম কোমল অনুভূতির রূপচিত্রণ পর্যন্ত বিভিন্ন দিকে প্রাকৃত ভাষার কবিরা যে কাব্য সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন, চিরকালের কাব্য রসিকের কাছে তা পরম উপভোগ্য সম্পদ হয়ে থাকবে। প্রাকৃত 'গৌড়বহো' (গৌড়বধ) মহাকাব্যের রচয়িতা বাক্‌পতিরাজ তাঁর কাব্যে তৎকালীন গ্রামজীবনের যে চিত্র এঁকেছেন, তা একান্ত বাস্তব এবং জীবন্ত। পুষ্পদত্ত রচিত 'নায়কুমারচরিউ' (নাগকুমার-চরিত) কাব্যে ভারতবর্ষে তৎকালে প্রচলিত জ্ঞানসাধনা, শিল্পসাধনা ও লোকাচারের কথা যথেষ্ট বিশ্বস্ততার সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। সোমপ্রভ রচিত 'কুমারপাল-চরিত' যদিও উপদেশমূলক কাব্য, তবু এই কাব্যের উপদেশাবলিতে পরোক্ষভাবে সমাজচিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। হালের 'গাথাসপ্তসতী' ছোট ছোট গীতিকবিতার সংকলন। এগুলিতে তৎকালীন সমাজের টুকরো টুকরো ছবি শিশির বিন্দুর মতো জ্বলজ্বল করে।

অপরদিকে 'পালি' বলতে বৌদ্ধশাস্ত্রের পংক্তি বা মূল শাস্ত্র ত্রিপিটককে বোঝানো হতো; পরে ক্রমে ক্রমে ত্রিপিটকের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যে-কোনো গ্রন্থই 'পালি' নামে অভিহিত হয়। ৬০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালকে পালি ও প্রাকৃতের স্থিতিকাল হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। প্রাকৃত ভাষার যে আদিরূপ ছিল, পালি তারই উপরে ভিত্তি করে একটি কৃত্রিম সাহিত্য ভাষা রূপে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রাকৃতের আদিরূপের সমসাময়িক হল পালিভাষা। প্রাকৃত ও পালি ভাষার মধ্যে প্রাকৃত ছিল প্রধানত জৈন

সাহিত্যের ভাষা আর পালি হল প্রধানত বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাষা। বৌদ্ধ সাহিত্য ছাড়া পালি ভাষাতে অন্য কোনো সাহিত্য রচিত হয়নি। তাই পালি সাহিত্য বলতে বৌদ্ধ সাহিত্যকেই বোঝায়; কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্য বলতে শুধু পালি সাহিত্যকেই বোঝায় না। কারণ পরবর্তীকালে বৌদ্ধরা মিশ্র সংস্কৃতেও কিছু ধর্মমূলক সাহিত্য রচনা করেছিলেন। পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধধর্মমূলক প্রধান সাহিত্যগুলি হল— ত্রিপিটক, বিনয়-পিটক, সুত্তপিটক, অভিধম্ম পিটক, অত্থকথা এগুলির বিস্তর আলোচনা এখানে নেই। তবে বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে রামায়ণ-মহাভারত-পুরান, ক্লাসিক্যাল সাহিত্য এবং তার বিভিন্ন ধারা-উপধারা পাশাপাশি প্রাকৃত ও পালি ভাষায় রচিত সাহিত্যের তুলনামূলকভাবে অনালোচিত অলিন্দে পরিমিত পরিসরে সমাজচেতনার আলোকে সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনা এবং প্রধান প্রধান স্রষ্টা ও সৃষ্টির ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাংলা ভাষায় এই প্রথম।

সূত্রনির্দেশ :

১। শ', রামেশ্বর, *সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য : সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৭০০০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ফ্রেব্রুয়ারি, ২০০৫, পৃষ্ঠা- ১২।

২। তদেব, পৃষ্ঠা- ৬১